দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাস সৃষ্টির পর্ব বিভাগ ও উপন্যাস সৃষ্টির নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপন্যাস সৃষ্টির পর্ব বিভাগ ও উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পী । নানা গুণে তাঁর উপন্যাস শিল্প প্রাণবন্ত। প্রাণের সঙ্গে গতির সম্পর্ক চিরকালীন। শিল্পী হিসাবে প্রমথনাথের চিন্তন, মনন ও কল্পনার স্তর একটি মাইলস্টোনেই থেমে থাকে নি তাঁর মধ্যে বেজে উঠেছে গতিবাদের সুর। সময়, সমাজ ও যুগবদলের সাথে সাথে শিল্পীর রচনাধারার পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন তাঁর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিংবা আঙ্গিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। শিল্পীর মন বিচিত্রগামী যদি কোন সাহিত্যিক তাঁর জীবনের প্রথম পর্বে রোমান্টিক ভাবধারাকে অনুসরণ করে থাকেন আবার সেই শিল্পই কখন যুগধর্মের প্রভাবে হয়ে ওঠেন বাস্তববাদী। শিল্পীর চেতনার গভীর ভাব ও রূপগত পরিবর্তনের সুর প্রকাশিত হয়। শিল্পীমন কখনও অতীতচারী আবার কখনও বর্তমানের আলোকে প্রতিনিয়ত বিচরণ করে থাকেন , শিল্পী বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গমন করেন বলেই সৃষ্টি এত বৈচিত্র্যময়।

ঔপন্যাসিক প্রমথনাথ ৬০ বছর সময় সীমার মধ্যে ১৮ টি উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উন্মেষ পর্বের উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে শকাব্দ ২১ শে চৈত্র ১৩৩১ এ - নানাকারণে 'দেশের শত্রু' উপন্যাসটি সফল সৃষ্টি না হলেও মাত্র ২৪ বছর বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাস 'দেশের শত্রুর' সাহিত্যিক মূল্য আছে। তাঁর লোকান্তরিত হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত (১৯৮৫) সর্বশেষ উপন্যাস 'পনেরোই আগষ্ট' প্রকাশিত হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে,

তাঁর উপন্যাস সৃষ্টির সময়সীমা ষাট বছরের মধ্যে বিধৃত।

ভারতের স্বাধীনতা এমনি একটি কেন্দ্রভূমিতে অবস্থিত যাকে উপলক্ষ্য করে কথাসাহিত্যের পর্ব বিভাগ করা যেতে পারে। দীর্ঘ ১৯০ বছর পরাধীনতার পর ভারতের স্বাধীনতা লাভকে যদি এই সময়কালীন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে প্রমথনাথের কথাসাহিত্যকে মূলতঃ দুটি পর্বে ভাগ করা যায়।

(১) প্রাক্ স্বাধীনতা পর্ব (১৯২৫-১৯৪৭)

(২) স্বাধীনতা পরবর্তী পর্ব (১৯৪৮-১৯৮৫)

এই দুই পর্বে ঔপন্যাসিক প্রমথনাথের ক্রমবিকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্ব (১৯২৫-১৯৪৬)

(১) দেশের শত্রু (১৯২৫)

(২) পদ্মা (১৯৪৩)

(৩) কোপবতী (১৯৪১)

(৪) জোড়দীঘির চৌধুরী পরিবার (১৯৩৫)

(৫) চলনবিল (১৯৪৬)

(৬) অশ্বত্থের অভিশাপ (১৯৪৭)

স্বাধীনতার পরবর্তী পর্ব ঃ-

(১) নীলমণির স্বর্গ (১৯৫৪)

(২) সিন্ধুনদের প্রহরী (১৯৫৫)

৩) কেরী সাহেবের মুন্সী (১৯৫৮)

(৪) লালকেল্লা (১৯৬৩)

(৫) বিপুল সুদূর তুমি যে (১৯৬৮)

(৬) পূর্ণাবতার (১৯৭১)

(৭) হিন্দী উইদাউট টীয়ার্স (১৯৭১)

(৮) ধুলো উড়ির কুঠি (১৯৭৭)

(৯) বঙ্গভঙ্গ (১৯৭৫)

(১০) পনেরোই আগষ্ট (১৯৭৭)

(১১) মহামতি রামফাঁসুরে।

(১২) শাহী শিরোপা।

এবার আমরা গবেষণা প্রকল্পের মধ্যে যে উপন্যাসগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা করব। কোনো লেখকের উপন্যাস রচনার পেছনে নেপথবর্তী ইতিবৃত্তের আলোচনা না করলে লেখকের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ঔপন্যাসিকের জীবনের মধ্যে কথা সাহিত্যের বাস্তব উপাদান নিহিত থাকে। শিল্পী নিরঙ্কুশ স্রষ্টা সাহিত্যিকের সাধনার লক্ষ্য বস্তু হল সৃষ্টি। সৃষ্টিধর্মিতা গড়ে ওঠে স্বপ্ন, চিন্তন ও ক্রিয়াশীলতার উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য স্বজ্ঞার মিলনেই শিল্পশোভন হয়ে ওঠে। স্বজ্ঞার সঙ্গে শ্রমনিষ্ঠা যুক্ত হয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয়। তবে শিল্প সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যার যত বেশী , তাঁর সাহিত্য তত জীবন রসসিক্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে কল্পনা শক্তিও রচনা শক্তির নিপুণতাগুণে সাহিত্য সার্থকতা লাভ করে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন বহির্জগত বা ইন্দ্রিয় জগতের শব্দ, স্পর্শ, দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ প্রভৃতির সঙ্গে অন্তর্জগত বা ভেতরের বোধ, বিশ্বাস, স্বভাব সাহিত্য সৃষ্টির মূলে কাজ করে। বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চবধের দৃশ্য দেখেন তখন একদিকে বাইরের নির্মম হত্যার ঘটনা অন্যদিকে লেখকের মন এই দুয়ের মিলনেই রামায়ণের প্রথম শ্লোক রচিত হয়েছিল । সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে যে কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল ঃ-

(১) বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা শক্তির মিশ্রণ ।

(২) অতীত স্মৃতি।

(৩) প্রকৃতি কিংবা বস্তু বিশ্বের কোনো উপাদান দেখে।

(৪) কোনো বিয়োগান্তক পরিণতি কিংবা মিলনমধুর ঘটনা দেখে ।

(৫) সৃষ্টির আনন্দে।

(৬) কারোও বিশেষ অনুরোধ রক্ষার্থে।

(৭) কোনো সাহিত্যিকের প্রভাবের ফলে।

(৮) সমকালীন যুগ ও জীবন ভাবনার প্রবল অভিঘাতে।

(৯) লেখকের কোন বিশেষ অনুভূতি থেকে।

(১০) আর্থ সামাজিক অবস্থা।

(১১) উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি।

(১২) ব্যক্তি জীবনের কোন ঘটনা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের নেপথ্যবর্ত্তী ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হলঃ

'দেশের শত্রু' (১৯২৫)

উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

'দেশের শত্রু' প্রমথনাথ বিশীর প্রথম উপন্যাস। লেখক যখন কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনে রাবীন্দ্রিক পরিমন্ডলে আবর্তিত তখনই এই উপন্যাসটির সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের বীথিকা গৃহে বসেই লিখেছেন আলোচ্য উপন্যাসটি। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ২১ শে চৈত্র ১৩৩১ সাল। মোট ১২টি অধ্যায়ে লেখা ৮৮ পৃষ্ঠার উপন্যাসটির ভূমিকা অংশে লিখেছেন ঃ " যাঁহারা যে

কোনো দেশে যে কোনো সময়ে যে কোনো উপায়ে মানুষের দেহ ও মনকে শৃঙ্খল মুক্ত রাখতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদিগকে এই উপলক্ষ্যে স্মরণ করিলাম।"

লেখক উপন্যাসটিকে প্রবন্ধেউপন্যাস বলবার পক্ষপাতী। উপন্যাসটির প্রকাশক সরোজ মোহন চৌধুরী, বাণী মন্দির, সদর ঘাট রোড, ঢাকা। এই উপন্যাসে তিনি ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্বদেশীনামাঙ্কিত স্বদেশ প্রেমিক এবং স্বদেশী কবিদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছেন। তৎকালীন ভন্ড নেতাদের বৃথা আস্ফালন, স্বজনপোষণ নীতি ও অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসকে প্রমথনাথ সমর্থন করেন নি। বৃহত্তর কলকাতার পটভূমিকায় লেখা আলোচ্য উপন্যাসে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্বার্থন্বেষী নেতাদের উদ্যোগে স্বরাজ ফান্ড গঠন করে অর্থ আত্মসাৎ, নারী জাগরণের নামে মেকী দেশাত্মবোধ, নারীর প্রতি আসক্তপরায়ণ ভন্ড স্বদেশ প্রেমিক ,সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার বরণের পেছনে নাটকীয় ঘটনা, জাতীয় শিক্ষার নামে কপটতা মূল প্রতিপাদ্য ।

প্রমথনাথ রবীন্দ্রনাথের মতো অকারণ উচ্ছ্বাসকে মেনে নেননি। তাঁর স্বদেশপ্রেমের ধারণা ছিল স্বতন্ত্র। ইতিমধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২), রবীন্দ্রনাথের গোরা (১৯১০) ঘরে বাইরে (১৯১৬) প্রকাশিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্রে দেশপ্রেমের অন্তরালে যে ভোগাকাঙ্ক্ষাই বড় করে দেখা দিয়েছে এই ধরণের ভন্ডামীকে লেখক মনেপ্রাণে সমর্থন করেন নি। প্রমথনাথের 'দেশের শত্রু' উপন্যাসে এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শান্তিনিকেতনে থাকাকালে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্রে গান্ধীজী এসেছিলেন। প্রমথনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর সাক্ষাৎ ঘটে। এই জাতীয় নেতার আদর্শ ও সক্রিয়তা প্রমথনাথকে স্বদেশ চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয়তা ও শান্তিনিকেতনের শিক্ষক নেপালবাবুর স্বদেশী ভাবধারা প্রমথনাথকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধকরেছিল সন্দেহ নেই। পিতা নলিনী নাথ

বিশীর স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে তিনবার কারাবাস ভন্ড নেতাদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি । এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথনাথের আলোচ্য উপন্যাসটি রচিত হয়েছে ; এটাই হল 'দেশের শত্রু' উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত ।

'পদ্মা'-(১৯৪৩)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

" পদ্মা প্রমথনাথের প্রথম উপন্যাস লিখবার চেষ্টা' বলে অভিহিত করেছেন । এখানে লক্ষ্যণীয় এই 'চেষ্টা ' কথাটি । যেহেতু এই মন্তব্যটি অনেক পরিণতকালের (১৩৭৮), তাই লেখক নিজের সৃষ্টিকেই সমালোচনার ছাড়পত্র দিতে দ্বিধাবোধ করেননি ।"[১]

গ্রন্থটি প্রমথনাথের দ্বিতীয় উপন্যাস । উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯৪৩, বিশ্ববাণী সংস্করণে এটি প্রকাশিত হয়েছে ভাদ্র ১৩৬৯ সালে । গ্রন্থটির প্রকাশকঃ ব্রজকিশোর মন্ডল । প্রথমনাথ শ্রী দেবেশচন্দ্র রায়কে উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন ।

চরচিলমারী , কলিকাতা, চরচিলমারী পুনর্বার , হিমালয় ও পদ্মা গর্ভে এই পাঁচটি পর্বে লিখিত ' পদ্মা' উপন্যাসটিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে । রোমান্টিক মোহ ও বাস্তবতার মেলবন্ধন ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসটিতে । প্রমথনাথ একাধারে ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক। কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের পড়াশুনো শেষে প্রমথনাথ রাজসাহীতে থাকতেন। জন্মসূত্রে পদ্মা বিধৌত নদী মাতৃক উত্তরবঙ্গের রাজসাহীর সন্তান ছিলেন । প্রমথনাথ বিশী তাঁর কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের রাঢ় প্রকৃতি ছিল তাঁর কৈশোর ও যৌবন চেতনার অন্যতম ধাত্রী । রাজশাহীতে যখন প্রমথনাথ থাকতেন তখন পদ্মা তীরের শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ প্রভৃতি ঋতুগত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি মুগ্ধতা আরও গভীরতা দান

করেছিল পদ্মা প্রকৃতিকে । রাজসাহীর অদূরেই পদ্মার প্রতি প্রমথনাথের সহজাত আকর্ষণ ছিল। পদ্মাতীরের সূর্যাস্তের ম্লানরশ্মি, জ্যোৎস্না আলোকিত রাতে পদ্মাতীরের খন্ড সৌন্দর্য তিনি দেখেছেন। দেখেছেন পদ্মাতীরের নির্জন হিন্দু মুসলমান অধ্যুষিত চর ভূমির অপূর্বশোভা । বন্ধুদের নিয়ে ঘুরেছেন চরচিলমারী , যেখানে কৃষক ভাইদের রবিশস্য ও খরিপ শস্য ফলাতে দেখেছেন।। পদ্মার পারে হিন্দু মুসলমানদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান দেখেছেন।

প্রকৃতির প্রতি প্রমথনাথের অনাবিল মুগ্ধদৃষ্টি এবং নিগূঢ় সৌন্দর্যানুভূতি তাঁর পদ্মাকেন্দ্রিক বিভিন্ন কবিতায় বিশেষভাবে ফুটে উটেছে । 'পদ্মার চর', 'বর্ষার পদ্মা ', মধ্যাহ্নের পদ্মা' , 'সূর্যাস্তের পদ্মা' প্রভৃতি কবিতায়পদ্মার অনুপম সৌন্দর্য ও নদীর সঙ্গেজীবনের সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে । মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার এই আত্মিক সম্পর্কটি প্রমথনাথের উপন্যাসে ধরা পড়েছে। পদ্মার বহিরঙ্গে মানবজীবনের কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে ।

'বর্ষার পদ্মা ' কবিতায় কবি বলেছেন -

"অশান্ত তরঙ্গ দোলে ক্ষুদ্র ডিঙিখানি
করে টলমল ,
কে বল রে জাগাইল সুপ্ত নদীজল
এমন সন্ধ্যায় ।" [২]

'অপরাহ্নের পদ্মা' কবিতায় —

"কচি মটরের ক্ষেত ,সবুজ মটর ,
এপারে ওপারে পদ্মা , মাঝে এই চরে
রাত্রি আসে নামি
তুমি আর আমি ।" [৩]

পদ্মা নদী বিভিন্ন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ । সেই বৈচিত্র্যকে আধার করে উপন্যাস শিল্পে রূপ

দিতে চেয়েছেন প্রমথনাথ । কথাসাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস রচিত হয়েছে বিভূতিভূষণের ইছামতী, তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রামে' উপন্যাসে । এছাড়া 'ময়ুরাক্ষী', 'কেয়া পাতার নৌকায়' ধলেশ্বরী নদী, ' নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ' উপন্যাসে শীতলক্ষা নদী, 'তৃণভূমি'তে দ্বারকা নদী গ্রামবাংলার জীবন প্রবাহ রূপেই দেখা দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের প্রকৃতি পদ্মার তীরের জনজীবনের আলেখ্য যেন সোনার কলমে লেখা সোনার ফসল রূপে দেখা দিয়েছে । 'পদ্মা' উপন্যাস প্রকাশের ঠিক এক বছর বাদেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' পদ্মা নদীর মাঝি ' প্রকাশিত হয়েছে । বিভিন্ন নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস গুলো প্রমথনাথের ' পদ্মা ' উপন্যাস রচনার প্রেরণা ।

চরচিলমারী অঞ্চলের স্থানিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন প্রমথনাথ বিশীর পরিচয় হয়েছিল 'পদ্মা' উপন্যাসের নায়ক বিনয়ের সঙ্গে । বিনয় নামক যে যুবকটি কলেজের ছাত্র , তার সঙ্গে প্রমথনাথের একাত্মতা গড়ে উঠেছিল । বিনয়ের সঙ্গে চরচিলমারীর কৃষক পরিবারের মেয়ে কঙ্কণের প্রেম প্রমথনাথের অজানা নয় । এই অঞ্চলের লোকশিল্প সোলার টোপর তৈরী । এই লোকশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করতে ও লোকশিল্পের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে প্রমথনাথ কঙ্কণ নামে এক চরচিলমারীর কৃষক পরিবারের কন্যাকে নায়িকারূপে গড়ে তুলেছেন । এ ছাড়া চরচিলমারীর কৃষকদের পাটচাষ করবার আগে দাদন দিতে আসত এক মহাজন । বনোয়ারীলালের মতো সুদখোর ও কুৎসিত মনোবৃত্তির চরিত্রের অভাব ছিলনা । কৃষিনির্ভর রাজসাহী জেলায় যা ছিল প্রমথনাথের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত । প্রমথনাথ বিশীর লেখা এক পত্রে ' পদ্মা ' উপন্যাসের পটভূমি বর্ণিত হয়েছে ঃ-

"পদ্মা আমার লিখিত প্রথম উপন্যাস বলা চলে । রাজসাহী শহরের কাছে পদ্মার যে শাখা তার মাঝখানে একটি স্থায়ী চর আছে । সেখানে চাষীরা বাস করে , রবিশস্য ও অন্যান্য ফসল ফলায় । এই চর ও চাষীদের নিয়ে একটি গল্প দাঁড় করাবার চেষ্টা হয়েছে । " [৪]

রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রখানাও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য ।

'শুভাকাঙ্ক্ষী রবীন্দ্রনাথ'

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী ।

Joari Rajshahi

ওঁ শান্তিনিকেতন ।

কল্যাণীয়েষু

তোমার বইটি যে অংশে পদ্মা মূর্তিমতী হয়ে দেখা দিয়েছে সে অংশটি আমার মনকে গভীর ভাবে আকর্ষণ করেছে । পড়তে পড়তে আমার হৃদয়ে আলোড়িত হয়েছে পদ্মার আশ্রয় থেকে আমার নির্বাসন দুঃখ । বুঝতে পারলুম যে দিকে তোমার কবির কলম চলছে সেদিকে রূপের প্রকাশ অপরূপ । কিন্তু ঔপন্যাসিক এসে যেখানে কলমটা জবর দখল করেছে সেখানে অত্যাচার হয়েছে । দুঃখ পেলুম যেহেতু আনন্দ পেয়েছিলুম ।

ইতি ৯ নভেম্বর ১৯৩৫

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

পদ্মা উপন্যাসের কঙ্কণের করুণ পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুন্ডলার' পরিণতি সমগোত্রের । এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয় ।

' কোপবতী '- (১৯৪১)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

' কোপবতী 'প্রমথনাথ বিশীর তৃতীয় উপন্যাস । উপন্যাসটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪১ সালে। পরম পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের করকমলে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন ঔপন্যাসিক ।' কোপবতী ' উপন্যাসের উৎসভূমি কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের কোপাই নদী। প্রমথ মানসে শুধু পদ্মানদীই নয় ভাগীরথী, যমুনা,কোপাই নদী বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কোপাই ছোট্ট নদী। কোপবতী আসলে কোপাই নদীর অপর নাম। এই ছোট্ট নদীটির সঙ্গে প্রমথনাথের হৃদ্যতা কতটা গভীরতা দান করেছে তা ' কোপাই' ও 'খোয়াই ' কবিতা পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়।

প্রমথনাথের ' দেয়ালি ' ও ' বসন্ত সেনা' কাব্যগ্রন্থে রোমান্টিক সৌন্দর্য মাধুরী মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। ' পদ্মা ' উপন্যাসে যেমন পদ্মাবিষয়ক কবিতা গুচ্ছের সঙ্গে যোগসূত্র বর্তমান তেমনি 'কোপবতী ' উপন্যাস পাঠ করলে 'কোপাই ' কবিতার সঙ্গে ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায়। ' দেয়ালি ' কাব্যগ্রন্থের ১৫ সংখ্যক কবিতায় কবি বলেন —

' হে কোপাই , তব তীরতরুচ্ছায়াতলে
এই কোলাহল হতে দিয়ো মোরেঠাঁই ।
তোমার অমৃত স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন জলে
সভ্যতার হলাহল ধুয়ে যেন যাই! " [৫]

কোপাই এর কৌমুদীশুভ্র বালু তট, জম্বুবন পল্লব অঞ্চল , বালুকাশায়ী ধীর গতির জল কবি মনে অপূর্ণ রাগিণী সৃষ্টি করেছে। কবি যখন আবার বলেন —

" একবার মনে হয় লোকালয় ছাড়ি

তোমার নির্জন তীরে দিতে হবে পাড়ি।"

"কবি কল্পনার জগতে ভেসে ওঠে প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণ যা সত্য ও সুন্দর।" [৬]

প্রমথনাথ কীটসের একান্ত অনুরাগী।

এছাড়া ' বসন্ত সেনা' কাব্যগ্রন্থে কোপাই কবিতায় যখন বর্ণনা করেন ----

" আমি তোমায় ভুলতে পারি ,

অয়ি কোপাই নদী ,

এমন কথা ভাবলে তুমি মনে।

তাই কি হেরি পল্লবিত

কিশলয়ের ব্যথা

সবুজ কথা বনে বনে।" [৭]

প্রমথনাথ ' রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ' গ্রন্থে লিখেছেন ----

" বরেন্দ্রভূমি আমার জন্ম ; সে লাল মাটির দেশ ; আবার রাঢ়ের লাল মাটির দেশে আমার দ্বিতীয় জন্ম। আমার দুই জীবনের দুই উদয় দিগন্ত লাল মাটির আভায় চিররক্তিম।" [৮]

'কোপবতী' উপন্যাসে বিমল ও ফুল্লরার কাহিনীর মধ্য দিয়ে লেখকের কলম বোলপুর ও শান্তিনিকেতনে স্থানিক বৈচিত্র্য রূপময় হয়ে উঠেছে। বিমল ও ফুল্লরার প্রেম, বনলক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সভায় তাদের অংশ গ্রহণ এক সৌন্দর্য চেতনার আলেখ্য। তাদের বিবাহিত জীবনের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয় নি। কোপাই এর প্রতি বিমলের মায়াবী আকর্ষণে কোপাই নদীর উৎস মুখে বিমলের যাত্রা বিমলকে শান্তি দিতে পারেনি - ' সে প্রকৃতিকেও পাইলনা, মানুষকেও হারাইল।' [৯]

বিমলের বাঘ শিকার, অসুস্থ অবস্থায় ফুল্লরার দর্শন ও প্রেম, কোপাইএর আকর্ষণে বিমলকে

প্রাণ দিতে হল। এই সব ঘটনা উপন্যাসে যে ভাবে ঘটেছে তার নেপথ্য ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ঘটনাগুলি লেখকের ব্যক্তিজীবনের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। শান্তিনিকেতনের অধ্যয়নকালে কোপাই নদীর তীরে বনভোজন উপলক্ষে কখনও বনভ্রমণ উপলক্ষে কোপাই এর খন্ড সৌন্দর্য দর্শন করতেন প্রমথনাথ। শান্তিনিকেতনের কাছেই কোপাই নদী। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে কোপাই যখন রুদ্র মূর্তিধারণ করে সেবার কয়েকজন মিলে প্রমথনাথ বনভোজনে গিয়েছিলেন। স্নান উপলক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে কোপাইএ নামতে গিয়ে নদীর প্রচন্ড বেগে কূল থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন। প্রতিকূল এই অবস্থা থেকে প্রমথনাথ রক্ষা পেয়েছিলেন সেবার এই ঘটনা প্রমথনাথের জীবনে দীর্ঘকাল রেখাপাত করেছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা তিনি যে ভাবে অর্জন করেছেন উপন্যাসের নায়ক বিমলের কোপাই গর্ভে বিলীন হবার সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া বড়দিনের ছুটিতে প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিগুপ্ত সহ গাধার পিঠে চেপে কোপাই নদীর উৎস সন্ধানে যাত্রা করেছেন এই ঘটনা কোপবতী উপন্যাসে বিমলের কোপাই এর উৎস সন্ধানে যাত্রার প্রতিফলন।লেখক যদিও প্রথম অভিযানে দুররাজপুর পর্যন্ত ও সর্বশেষ অভিযানে কোপাই নদীর উৎসে পৌঁছাতে পেরেছেন। জায়গাটির নাম খেজুরি, সাঁওতাল পরগণার প্রায় সীমান্তে ; উচ্চ মালভূমি ধৌত জল থেকে কোপাই নদীর উদ্ভব, আসলে এটাই কোপাই নদীর উৎস।

আবার বিমলের বাঘ শিকারের ঘটনাও লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। সুধাকান্ত, জগদানন্দ,প্রমথনাথ ও অন্যান্য বাঘ শিকারীর দল শান্তিনিকেতনের বনভূমিতে একটি চিতাবাঘকে গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করে। এই ঘটনাই যে পরবর্তী ' কোপবতী ' উপন্যাসে স্থান পেয়েছে একথা বলাটা অসঙ্গত নয়।

নিসর্গ প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে প্রমথনাথ মুগ্ধ। প্রকৃতিকে তিনি যেমন ভাবে দেখেছেন

ঠিক তেমনি ভাবেই কোপবতী উপন্যাসে স্থান পেয়েছে তা নিঃসন্দেহে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ যেমন খন্ড সৌন্দর্যের মধ্যে অখন্ড সৌন্দর্যের অনুভব করেছেন । তেমনি খন্ড সৌন্দর্যের পথ রেখে প্রমথনাথ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের আভাস পেয়েছেন। শান্তিনিকেতনে থাকাকালে শাল, মহুয়া, শিরীষ, গোলকচাঁপা, ছাতিম গাছ,রজনীগন্ধা, ঝুমকো ফুল ,রক্ত করবী, বৈচী ফুল, মালতী, কেয়া,শিউলি ও বকুল ফুলের সৌরভ বনলক্ষ্মী এক মোহময় আবেশ সৃষ্টি করেছে। প্রমথনাথ ' কোপবতী ' উপন্যাসে তালবনী গ্রামের সৌন্দর্য যেমন বর্ণনা করেছেন তেমনি এর দ্বৈতলীলা রুক্ষপ্রান্তর ও কোপাই এর রুক্ষতা উপন্যাসে ফুটে উঠেছে । এই হল ' কোপবতী ' উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিহাস।

'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' – (১৯৩৫)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

' জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসটি প্রমথনাথের সফল সৃষ্টি। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৩৫। মহাকাব্যধর্মী ' জোড়াদীঘির উদয়াস্ত ' উপন্যাসটি তিনটি খন্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খন্ডে 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', দ্বিতীয় খন্ডে ' চলনবিল ' ও তৃতীয় খন্ডে ' অশ্বত্থের অভিশাপ' এই উপন্যাস ত্রয়ীতে উত্তরবঙ্গের রাজসাহী ও পাবনার এক জমিদার পরিবারের প্রায় দেড়শত বৎসরের উত্থান, পতন, বন্ধুর ইতিহাসের আলেখ্য নিয়ে গঠিত। বিশেষ অঞ্চলের স্থানিক বৈচিত্র্য ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে রূপায়িত করেছেন প্রমথনাথ।

ড ঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থপরিচিতি অংশে লিখেছেন ——

'' বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', ও ' আরণ্যক ' ও তারাশঙ্করের 'ধাত্রী দেবতা ', ' নাগিনী কন্যার কাহিনী ' ও ' হাঁসুলি বাঁকের উপকথা ' তে বহিঃ প্রকৃতি মানব কাহিনীর মধ্যে

আরও অন্তরঙ্গভাবে অনুপ্রবিষ্ট ও ঐ কাহিনীর প্রেরণা উৎস ও ছন্দ নিয়ামক।" [১০]

অতীত স্মৃতি বা অতীতচারিতা কথা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান । ইতিহাস সচেতক প্রমথনাথ ছিলেন ঐতিহ্যচেতনার বিশ্বাসী। প্রমথনাথের উপন্যাসের বৃহদংশ অতীতকে ঘিরে আবর্তিত হলেও নবীনের সঙ্গে সমন্বয় ঘটেছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রমথনাথ মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্যানুসারী। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঘটনা প্রধান,মহামানব চিত্রণনিষ্ঠ, রাজা, জমিদার বা উচ্চবিত্ত নির্ভর চরিত্র আনয়নে আগ্রহী। রবীন্দ্রনাথ অভিজাত শ্রেণীর চরিত্র চিত্রিত করেছেন , শরৎ সাহিত্যে গ্রামীণ জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী বিত্তবান চরিত্র দুর্লভ নয়। সচ্ছল জমিদার পরিবারের সন্তান হয়ে প্রমথনাথ ছিলেন জমিদারের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি অতীতাশ্রয়ী জমিদারদের নিয়ে কথাসাহিত্য রচনার প্রতি আগ্রহী। তবে 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসে মধ্যযুগীয় জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক যুগের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক সচেতনভাবেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। প্রমথনাথ নিজে জমিদার পুত্র। রাজসাহীতে ছিল তাঁর পৈতৃক জমিদারী । অথচ কোম্পানীর শাসন কালে সামন্ততন্ত্রের বিলয় ঘটেছে — কোন পথ ধরে তাঁদের আজন্মলালিত জমিদারী তাসের ঘরের মতো তচনচ হয়ে গেল তা তাঁর অজানা নয়।

' জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাস রচনাকালে ঔপন্যাসিককে উপকরণ যুগিয়েছে 'রাজসাহীর ইতিহাস ' ও রাজসাহীও পাবনার ' ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ' এর প্রাপ্য বিভিন্ন তথ্যাবলী।

মধ্যযুগীয় ভাবধারায় জমিদারে জমিদারে বিরোধ , ক্ষমতার দম্ভ , তাদের অত্যাচার, আত্মমর্যাদা প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা নায়েব, গোমস্তা, পাইক , বরকন্দাজ , লাঠিয়াল ও সরকিবাজদের দৌরাত্ম্য , লুঠতরাজ , দাঙ্গা প্রভৃতি ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। এই সব সামন্ততন্ত্রিক আচরণ প্রমথনাথের অতি পরিচিত। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে ও লেখকের কল্পনাপ্রসূত কাহিনী

অতীত ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে প্রমথনাথের আলোচ্য উপন্যসের পরিকল্পনা। জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার উপন্যাসে জোড়াদীঘির জমিদার ও রক্তদহের জমিদারের বিরোধের ইতিহাসে বর্ণনা করতে গিয়ে স্থানীয় কিংবদন্তী , লোকশ্রুতি, লোকপ্রবাদ লেখকের উপন্যাস রচনার নেপথ্যে কাজ করেছে। যুগপরিবেশ ও অতীত ঐতিহ্যের দুর্নিবার আকর্ষণে রাজসাহী ও পাবনা জেলার আঞ্চলিক জীবনের নানা পরিচয় উপন্যাসটিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রমথনাথ আলোচ্য উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন ——

" পাঠক , তুমি ভাবিছে এ কি হইল; তোমার গল্পপাঠের আগ্রহের পারদ দেখিতে দেখিতে নামিয়া একেবারে নৈরাশ্যের কোঠায় গিয়া ঠেকিয়াছে। তুমি ভাবিয়াছিলে , বালীগঞ্জ বিলাসী এক জোড়া রুগ্ন যুবক, যুবতীর গল্প শুনিবে , তাদের বৈকালিক চায়ের পেয়ালার আকাশে সুদীর্ঘ ফ্রয়ডিয়ান তত্ত্বের আলোচনায় তোমার যৌন ক্ষুধা মিটিবে; প্রক্ষিপ্ত দু চারটা কঁতিনাঁতাল নাম তোমার বান্ধবী সভায় আলাপের মূলধন রূপে পাইবে। কিন্তু ; এ কেমন গল্প , বহুবৎসর আগেকার এক নগণ্য গ্রাম জোড়াদীঘি এবং তারই নগণ্যতর কথা !..... গল্প আরম্ভ হইবার আগে সেই যুগটার কথা একটু শুনিয়া লও । সত্য কথা বলিতে কি পাঠক, তোমাদিগকে একটু ইতিহাস শুনাইব ।"

এই উক্তি থেকে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে প্রমথনাথ সমকালীন ইতিহাসে ও যুগ সচেতন ছিলেন । প্রমথনাথ ব্যক্তিগতভাবে অতীত ইতিহাসের সমালোচনায় মুখর । পলাশীর যুদ্ধের ঘটনা, পলাশীর প্রান্তরের অতীত ভগ্নাবশেষের বর্ণনা ইত্যাদি তথ্য ও পরিবেশন লেখকের পলাশী ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। এটাই 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' উপন্যাসের নেপথ্যবর্ত্তী ইতিহাস ।

'চলনবিল'-(১৯৪৬)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

প্রমথনাথের জোড়াদীঘির উদয়াস্ত ট্রিলজির একই কাহিনীর তিনটি অংশের দ্বিতীয় অংশের নাম ' চলনবিল '। বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী উপন্যাস লিখেছেন সরোজ কুমার রায়চৌধুরী তাঁর ময়ূরাক্ষী (১৩৪৩), গৃহকপোতী (১৩৪৪) এবং সোমলতা (১৩৪৫) এই তিনটি উপন্যসের একত্র নাম ' নতুন ফসল '। তারাশঙ্করের গণদেবতা (১৩৪৯), পঞ্চগ্রাম (১৩৫০) ভিন্ন নামে চিহ্নিত উপন্যাসদ্বয় একই কাহিনীর দুটি অংশ। উপন্যাস কাহিনীর শুরু হয়েছে গণদেবতায় এবং পরিণতি ঘটেছে পঞ্চগ্রামে। উপন্যাসের পূর্ণতা এসেছে দুটি কাহিনীর সম্মিলিত রূপেই। এছাড়া তারাশঙ্করের ' জবানবন্দী ' উপন্যাসে জমিদারের ছয় পুরুষের বিস্তৃত কাহিনী উপস্থাপিত করেছেন যেখানে জমিদারী উদয় থেকে সামন্ততন্ত্রের বিলয় পর্যন্ত বিস্তারিত ঘটনাবিন্যাস স্থান পেয়েছে। ঠিক তেমনি জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবারের পঞ্চম পুরুষের বিস্তৃত কাহিনী বহু নায়কত্বে পরিবেশন করেছেন প্রমথনাথ।

' চলনবিল ' উপন্যাসের নেপথ্যভূমি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে প্রমথনাথের জন্মভূমি রাজসাহী জেলার জোয়াড়ী গ্রামে ৮— ১০ কিমি অদূরেই একটি বিল অবস্থিত যার নাম ' চলনবিল '। রবীন্দ্রনাথ জমিদারী কাজ দেখাশুনা করতে গিয়ে চলনবিলের সঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বহু কিংবদন্তী ও বহু ঘটনার সাক্ষীরূপে এই বিলটিকে উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পের পটভূমিরূপে নির্বাচন করেননি। অথচ কথাসাহিত্যে ভৌগোলিক পটভূমিরূপে চলনবিল একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের দাবী রাখে। লেখকের জানা ছিল চলনবিল কেন্দ্রিক কোন সাহিত্য রচিত হয়নি অথচ চলনবিলের অতীত ইতিহাস আছে কাজেই অতীত ইতিহাসের সূত্রধরে চলনবিল সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা কথাসাহিত্যে নতুন

পটভূমি , বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন । শৈলজানন্দ বীরভূম জেলার কয়লাকুঠি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে , তারাশঙ্কর রাঢ় অঞ্চলের প্রকৃতি , বিভূতিভূষণ নিশ্চিন্দিপুর গ্রামকে উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে বেছে নিয়েছেন। প্রমথনাথ পাবনা জেলার অন্তর্গত ' চলনবিল ' কে ভৌগোলিক পটভূমি হিসাবে নির্বাচন করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে ।

যদিও এই উপন্যাসের উপকরণ যুগিয়েছিল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার গ্রন্থের প্রাপ্ততথ্য। রাজসাহী ও পাবনা এই দুই জেলার সীমান্ত জুড়ে চলনবিল নামে একটি সুবৃহৎ জলময় ভূখন্ড আছে । ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার গ্রন্থের ১৯০৯ সালের পূর্বের তথ্যানুসারে জানাযায় রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমার শিংড়া থানার নিকট থেকে পাবনা জেলার অষ্টমনিষা গ্রাম পর্যন্ত এই বিল বিস্তৃত । পূর্বে এই বিলটি চারশত একুশ বর্গমাইল স্থান পর্যন্ত বিস্তৃতছিল । আত্রেয়ীর জলরাশি চলনবিলের উপর দিয়ে এসে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে । ১৯০৯ সালে চলনবিল সম্পর্কে তদন্তকারী কমিটি একশ বিয়াল্লিশ বর্গমাইলের মত চলনবিলের আয়তন উল্লেখ করেছেন , ২২২ ১/২ মিলিয়ন ঘনফুট পলি বিলে প্রবেশ করে এর নাব্যতা কমিয়ে দিয়েছে । ১৯১৩ সালের তদন্ত অনুসারে জানাগেছে চলনবিলের বিস্তৃত অংশের ভরাট হয়ে যাবার পর ও ১২ থেকে ১৫ বর্গমাইল স্থানে সারা বছর জল থাকে । চলনবিলের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যে সব মন্দির, অট্টালিকা, পুস্করিণী দেখতে পাওয়া যায় তাতে মনে হয় এক সময়ে সেখানে সমৃদ্ধির অভাব ছিল না ।আলোচ্য উপন্যাসে লেখক ১২৫ বছর আগেকার চলনবিলের ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ।

চলনবিলের সাথে ক্ষুদ্র একটি দ্বীপে বেণী রায়ের ভিটায় ডাকাত কালীর মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও হিঃ ৯৯৭ সালে বঙ্গদেশে মানসিংহ আগমনের তথ্য আবার পরশুরামের ডাকাতদলের দৌরাত্ম্য , চলনবিলে সঞ্চিত পলিতে যে অংশ জেগে উঠেছে সেখানের কৃষি সভ্যতা গড়ে ওঠার বিস্তারিত বিবরণ প্রমথনাথ সংগ্রহ করেছেন " রাজসাহীর ইতিহাস " ও ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার

গ্রন্থ থেকে। এ ছাড়াও মাধব পালের পূর্বপুরুষ চলনবিলের বসবাসের তথ্য , চৌধুরী পরিবারের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের ধুলো উড়ির কুঠিতে আশ্রয়লাভ এবং বাঁধ নির্মাণ করে কৃষিযোগ্য জমিতে রূপান্তরের প্রচেষ্টা ইত্যাদি তথ্য উক্ত গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেছেন ঔপন্যাসিক। চলনবিলের উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাস্তব ও কল্পনার আলোকে উপন্যাসটির শিল্পরূপ দিয়েছেন কথাশিল্পী প্রমথনাথ ।

'অশ্বত্থের অভিশাপ' - (১৯৪৭)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

' জোড়াদীঘির উদয়াস্ত ' ট্রিলজির তৃতীয় খন্ড ' অশ্বত্থের অভিশাপ 'উপন্যাসের বিষয় হল জোড়াদীঘির প্রাচীনতম অপরিবর্তনীয় অশ্বত্থকে কেন্দ্র করে চিরাচরিত বিশ্বাস ও আধুনিক ভাবধারা পুষ্ট জমিদারের শরিকি দ্বন্দ্বে বৃক্ষ ছেদন ফলে জোড়া দীঘিতে ভূমিকম্পে বিপর্যয়ের ঘটনা।

উপন্যাসটির রচনার পেছনে তারাশঙ্করের ' হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের বিল্ববৃক্ষ উপড়ে ফেলবার ঘটনার প্রভাব ছিল সন্দেহ নেই । জোড়াদীঘির জমিদার বাড়ীর উত্থান ও পতনের ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই অশ্বত্থ বৃক্ষটি। ' চলনবিল' উপন্যাসের কিশোর দীপ্তিনারায়ণের পুত্র কীর্তিনারায়ণ এবং তাদের শরিক নবীননারায়ণের শরিকি দ্বন্দ্ব বর্ণনায় তারাশঙ্করের 'জবানবন্দী' উপন্যাসের প্রভাব বর্তমান।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর জমিদারদের মধ্যযুগীয় আবহ থেকে অনেকটা মুক্ত আধুনিক চিন্তাধারার অভিব্যক্তি ঘটেছে আলোচ্য উপন্যাসে । যখন কোম্পানীর শাসনকালে আমলাদের কূটনীতির জালে আবদ্ধ হয়েছিল তৎকালীন জমিদার সম্প্রদায় । জোড়াদীঘির ছ' আনির জমিদার নবীননারায়ণ ও দশ আনির জমিদার কীর্তিনারায়ণ কিভাবে জমিদারী ব্যক্তিত্ব বিকিয়ে

দিয়ে আইনের আশ্রয় পুষ্ট হয়ে আইনের ক্রীড়নকে রূপান্তরিত হয়েছিল লেখক তাঁর যথাযথ বর্ণনা দিয়েছিলেন আলোচ্য উপন্যাসে ।

সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঔপন্যাসিক ' অশ্বত্থের অভিশাপ ' উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ করেছেন । ' ডিস্টিক্ট গেজেটিয়ার' ও 'রাজসাহীর ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ও তারাশঙ্করের ' জবানবন্দী ' ও ' হাঁসুলী বাঁকের ইতিকথা ' র প্রভাব অশ্বত্থের অভিশাপ ' উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

'কেরী সাহেবের মুন্সী '- (১৯৫৮)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা উপন্যাসে অতীতজীবন ও ইতিহাস নিয়ে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন উপন্যাসিক। সমসাময়িক মধ্যবিত্ত জীবনবোধের উপর আকৃষ্ট না হয়ে অতীতে বিচরণ করেছেন। বিমল মিত্রের ' সাহেব বিবি গোলাম ' 'বেগম মেরী বিশ্বাস' শরদিন্দুর ' তুঙ্গভদ্রার তীরে', ' তুমি সন্ধ্যার মেঘ', দেবেশ রায়ের ' রক্তরাগ', প্রতাপ চন্দ্রের 'জব চার্নকের বিবি', গজেন্দ্র মিত্রের ' বহ্নিবন্যা 'র পাশাপাশি প্রমথ নাথ লিখলেন 'কেরী সাহেবের মুন্সী'।

বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস চর্চায় প্রমথনাথের ছিল গভীর আগ্রহ, তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রমাণ 'চিত্র চরিত্র' গ্রন্থ । ' চিত্র চরিত্র' গ্রন্থে তিনি বাংলার মনীষীদের বন্দনা করেছেন । পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অভিঘাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর নবজাগরণের ইতিহাসের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন প্রমথনাথ বিশী।' কেরী সাহেবের মুন্সী ' উপন্যাসে তিনি ইয়ং বেঙ্গল সমাজের জন্ম ও বিকাশ ঘটেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন কাহিনী গ্রন্থনে।

' চিত্র চরিত্র ' গ্রন্থে মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের বন্দনা করতে গিয়ে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের যুগ সন্ধিকালের অর্থাৎ ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ সালের কলকাতার বিস্তারিত বিবরণ ও মনীষীদের বন্দনা আলোচ্য উপন্যাসের নেপথ্যবর্ত্তী ঘটনা ।

উইলিয়ম কেরী , রামরাম বসু , দ্বারকানাথ , নবকৃষ্ণ , রাধাকান্ত দেব , রামমোহন , টমাস , মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র তিনি উপস্থাপিত করেছেন আলোচ্য উপন্যাসে ।' কেরী সাহেবের মুন্সী ' উপন্যাসে লেখকের বক্তব্য অংশে জানিয়েছেন --

'' বছর পনেরো আগে রামবসুর জীবন নিয়ে কিছু একটা লিখবার ইচ্ছা হয় , তখন ধারণা ছিল না যে তা ঠিক কি আকার ধারণ করবে । তারপরে বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে বিস্মিত হয়ে গেলাম, রামরাম বসু প্রসঙ্গে উইলিয়ম কেরীকে পেলাম । বুঝলাম যে যে সব মহাপ্রাণ ইংরেজ এদেশে এসেছেন , উইলিয়ম কেরী তাঁদের অগ্রগণ্য। কেরীর ধর্ম জীবন , ধর্ম প্রচারে আগ্রহ বাংলা গদ্য সৃষ্টিতে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় অভিভূত করে দিল আমাকে । তখন ধীরে ধীরে কেরী ও রামরাম বসুকে অবলম্বন করে কাহিনীটি রূপগ্রহণ করে উঠল ।''[১২]

বস্তুত রামরাম বসু জীবন কাহিনী লিখতে গিয়ে কলকাতা শহরের এক নিখুঁত চিত্র লেখক তুলে ধরবার প্রয়াসী হয়েছেন । কলকাতা সোনার খনি বিশেষ এখানে যে মূল্যবান উপকরণ রয়েছে তার যথাযথ বর্ণনা কথা সাহিত্যে লেখক ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী । বাংলা গদ্য বিকাশের পথ বেয়ে যেমন উইলিয়ম কেরী ও রামরাম বসুর প্রসঙ্গ এনেছেন সেই সঙ্গে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে পাদ্রীদের ভূমিকা , কলকাতার বাবু সমাজের চিত্র , ইংরেজী প্রেম ,সতীদাহ প্রথার বীভৎসতা , ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে স্থাপন ও পঠন পাঠনের বর্ণনা দিয়েছেন ।

প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে কলকাতার খন্ড চিত্র স্থান পেয়েছে সন্দেহ নেই। তবে কলকাতার ভাঙাগড়ার ইতিহাস এখানে স্থান পায় নি। প্রমথনাথ কলকাতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কনে আগ্রহী তবে গ্রন্থ রচনায় যে 'আলালের ঘরের দুলালের' প্রভাব আছে তাতে

সন্দেহ নেই। এছাড়া পার্সিভালের 'দি বেঙ্গলি নবাব' গ্রন্থটি প্রমথ নাথ পাঠ করেছেন এই বই থেকে ইংরেজ ও নবাবদের যুদ্ধের বর্ণনা সংগ্রহ করেন। এছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কলকাতার তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রমথনাথ। ভারতের রাইটারদের উন্মত্ত উল্লাস, ভোগাকাঙ্ক্ষা, বিয়ার বোতলের আসক্তি, কেটি ও লিজাকে দেখে মস্তানদের উল্লাস কলকাতার সমকালীন ঘটনার প্রতিফলন।

কলকাতার প্রতি লেখকের আকর্ষণ ছিল । কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ কোন উপন্যাস রচিত হয়নি তাই লেখক কলকাতা কেন্দ্রিক উপন্যাস লেখবার সঙ্কল্প করেছেন। লেখক ভূমিকা অংশে জানিয়েছেন-

" কলকাতা শহরের প্রাচীন অংশের প্রত্যেক পথঘাট , অট্টালিকা, উদ্যান , প্রত্যেক ইষ্টক খন্ড বিচিত্র কাহিনী রসে অভিষিক্ত। এ শহরের একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে যা ভারতের প্রাচীন শহরবাংলার ব্যক্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র। ভারতের প্রাচীন ও নবীন যুগের সীমান্তে অবস্থিত এই শহর। এর অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও না ভালবেসে পারা যায়না একে , কারণ এ আমার সমকালীন । সমকালীনতার দাবি এ শহরে সকলের প্রতি ।" [১৩]

এ ছাড়াও জোড়ামউ গ্রামের সতীদাহকে নিয়ে গ্রাম্য দলাদলি , মদনাবাটি ও শ্রীরামপুরে ছাপাখানা স্থাপন ও বিদ্যালয় স্থাপন বাংলা গদ্যের বিকাশ প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে ঔপন্যাসিক 'কেরী সাহেবের মুন্সী ' উপন্যাস লিখবার সঙ্কল্প নিয়েছেন । লেখক কোন ধর্ম , কোন সম্প্রদায় কিংবা কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে আঘাত দেবার উদ্দ্যেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন নি । রচনা করেছেন "একটা সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পর্বের কয়েকটি বিশেষ নরনারীর সুখ দুঃখের লীলা কে অবলম্বন করে নির্বিশেষ মানব সমাজের সুখ দুঃখের জীবন অঙ্কন লেখকের উদ্দেশ্য।"[১৪]

অপর্ণা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় " বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাস গ্রন্থে 'কেরী সাহেবের মুন্সী', উপন্যাসে রামরাম প্রসঙ্গে লিখেছেন —

" রামরাম বসুর কথা বিশদভাবে বাঙালীর নিকট প্রথম বলেন দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার " বঙ্গভাষা ও সাহিত্য " গ্রন্থে । সেখানে তাঁহার দুষ্ট প্রকৃতির স্পষ্ট পরিচয় আছে । শ্রীরামপুরের মিশনারীদের বিভিন্ন রচনায় তাঁহার পরিচয় দীনেশচন্দ্র সেনের অবলম্বন। মিশনারীরা বসু মহাশয়ের প্রচুর প্রশংসা করিয়াও তাঁহাকে শঠ ও প্রবঞ্চক , লম্পট ও ভ্রূণ হত্যাকারী বলিয়া গিয়াছেন। উপন্যাসে দেখা যায় মুখরা স্ত্রীর বাক্যের যন্ত্রণায় টুসকী নামে এক বারবণিতার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আছে। মালদহের মদনাবাটী যাইবার পথে কেরী রেশমী নামে এক বালিকাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইবার পরিণাম হইতে রক্ষা করে । রেশমীর যৌবনোদগম হইলে মানসিক পীড়নে অস্থির রামবসু এক রাত্রিতে তাহার নিকট যাইয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে । বাস্তবের রামবসু ইহা অপেক্ষা হীন চরিত্রের ছিলেন। তাহার দুষ্টু প্রকৃতির অপর পরিচয় পার্বতী মুখার্জীর যোগসাজসে কেরী টমাস প্রভৃতিকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের নামে প্রবঞ্চনা করিয়া বহু অর্থ আত্মসাৎ করে । ঔপন্যাসিক সে বিষয়ে নীরব। তাঁহার বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় উপন্যাসে আছে , কিন্তু উপন্যাসে একাধিকবার প্রশংসিত তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রেরণায় কৃত কোন কর্মের উল্লেখ অথবা পরিচয় পাওয়া যায় না । রামরাম বসুকে বাঙালী জানে "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ' পুস্তকের লেখক হিসাবে। তাঁহার জীবনের এই স্মরণীয় সাহিত্য কর্মের দুইবার মাত্র সামান্য উল্লেখ আছে উপন্যাসে ।"[১৫]

ঔপন্যাসিক 'কেরী সাহেবের মুন্সী ' উপন্যাসের নেপথ্যে দীনেশচন্দ্র সেনের ' বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ' গ্রন্থটির সাহায্যে নিয়েছেন এ ব্যাপারে কোন সংশয় নেই । গ্রন্থটি লেখক উৎসর্গ করেছেন —দেবেশ চন্দ্র রায়কে এবং এর প্রথম প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৮০ ।

‘ লাল কেল্লা ’- (১৯৬৩)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

‘ লালকেল্লা ’প্রমথনাথ বিশীর উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ফাল্গুন ১৩৭০ সালে ।ঐতিহাসিক উপন্যাস রাজ্যের হর্ষবর্ধন শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন এই উপন্যাসটি । বহু আকাঙ্ক্ষিত ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় ভাবনা নিয়ে ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার আকস্মিক জোয়ার এসেছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতির অতীত গৌরব স্মরণেচ্ছা ও ফেলে আসা ঐতিহাসিক ঘটনা ও যুদ্ধের নতুন তাৎপর্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আবিষ্কারের প্রয়াস এ জাতীয় উপন্যাস রচনার নেপথ্যে কাজ করেছিল।

বিশেষ করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হল সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) । সিপাহী বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এর নব মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একদিকে ঐতিহাসিকরা যেমন লেখনী ধারণ করেছিলেন অপরদিকে ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও এই ধারার ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আগ্রহ দেখা গিয়েছিল ।সিপাহী বিদ্রোহ অবলম্বনে লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রমথনাথ বিশীর ‘ লালকেল্লা ’ গজেন্দ্র কুমার মিত্রের ‘ বহ্নিবন্যা ’ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন । বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রকে যথার্থ গুরু হিসাবে মেনে নিয়েছেন ।

উপন্যাসের গঠনরীতির দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের মত পরিচ্ছেদের নামকরণে তিনি আগ্রহী ।

এছাড়া তারাশঙ্করের ‘ গন্নাবেগম ’ উপন্যাসের মোঘল যুগের ষড়যন্ত্র , রিরংসা, দরবারী

চিত্র, গজলপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয় ' লালকেল্লা ' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনীয় । সুতরাং ' লালকেল্লা' উপন্যাসের উপর ' গন্নাবেগমের ' প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয় ।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসের সঙ্গে প্রমথনাথের উপন্যাসের নায়ক নির্মিতিতে পার্থক্য বর্তমান। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে রাজা বাদশা, জমিদার ইত্যাদি উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে উপন্যাসের নায়ক করেছেন। সেখানে প্রমথনাথ বিশীর উপন্যাসের নায়ক করেছেন সাধারণ স্তরের মানুষকে। একজন কোম্পানীর রেসেলাদার আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক ।

'লালকেল্লা ' উপন্যাসে সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা মূল বিষয় । সিপাহী বিদ্রোহকে নব্য যুগের প্রথম সিংহনাদ বলে ঐতিহাসিক ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিতর্ক থাকতে পারে কিন্তু শিল্পী প্রমথনাথের দৃষ্টিতে এই বিদ্রোহের ফলে হিন্দুস্থানে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে নরনারীদের মধ্যে গভীর বেদনা আর্তি প্রকাশিত হয়, ইতিহাস সত্য ও সাহিত্য সত্যের মিলনে তারই অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক ।

লেখক জানিয়েছেন সিপাহী বিদ্রোহের ডায়েরী লেখক জীবনলাল আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক জীবনলাল স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইতিহাস সম্ভাবনা সঞ্জাত চরিত্র জীবনলাল। ঐতিহাসিক ব্যক্তি বাহাদুরশাহ , জিনৎমহল, নিকলসন, উইলসন প্রভৃতি । অনৈতিহাসিক পাত্রপাত্রী তুলসী রুমালী , নয়নচাঁদ ,স্বরূপরাম ,গুরুবচন প্রত্যেকেই তরুণ কেননা বিদ্রোহের সময় তরুণ সম্প্রদায়ের ভূমিকাই প্রধান ।

কামানের মুখে দুই পান্ডেকে উড়িয়ে দেবার ঘটনা উপস্থাপনে লেখক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহকালে এ ভাবেই অপরাধী সন্দেহে শাস্তি দেওয়া হত। কাজেই এ ঘটনা স্থান পাবার মূলে রয়েছে ইতিহাস ।

ছড়া, হিন্দী গান, গজল , সঙ্গীতজ্ঞ পন্ডিত বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলেই উপন্যাসে সেগুলি উপস্থাপিত হয়েছে ।

'লালকেল্লা' উপন্যাস রচনার নেপথ্যে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লেখক ভূমিকা অংশেই তা জানিয়েছেন -

" মানুষকে যেমন ভূতে পায় আমাকে তেমনি দিল্লিতে পেয়েছিল । পেয়েছিল বা বলি কেন , দিল্লির ভূত এখনও সম্পূর্ণ আমার ঘাড় থেকে সম্পূর্ণ নামে নি । আবার কোনদিন কলম হাতে দিল্লির প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হবে। কিছুই বিস্ময়ের নেই এতে । দিল্লির কি একটি রহস্যময় দুর্বার আকর্ষণ আছে, যার টানে কালে কালে —পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও আধুনিককালে — চন্দ্র বংশের নৃপতিগণ , হিন্দুরাজগণ ,পাঠান মুঘল , ইংরেজ ও স্বাধীন ভারতের সরকার দিল্লিতে শাসনের আসন পেয়েছে। সেই আকর্ষণে সামান্য একজন লেখকের চিত্ত যে মুগ্ধ হবে এতো খুবই স্বাভাবিক ।" [১৬]

'লালকেল্লা' উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত বর্ণনায় লেখক ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন । রাজ্যসভার সদস্য রূপে প্রমথনাথ বহুবার কর্মসূত্রে দিল্লিতে গিয়েছিলেন সেই অভিজ্ঞতাই তাকে আলোচ্য উপন্যাস রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং উপন্যাস সৃষ্টির মূলে সে অভিজ্ঞতাই যে প্রধান তা লেখক স্বয়ং স্বীকার করেছেন ——

" অনেক কাল আগে চাঁদনিচকে একাকী ঘুরতে ঘুরতে আজকার দিনের জনসংঘট্ট রূপান্তরিত হল । এ যুগের লেখক সে যুগের একজন পথিকে পরিণত হয়ে গেল । কোন অজ্ঞেয় যাদু মন্ত্রে কালস্রোতের উজান উঠলে সেকালে গিয়ে পৌছলো — সে অভিজ্ঞতা কখনো ভুলবার নয় । দেশকালের এই বিভ্রান্তি অনেকদিন তাকে মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় রেখেছিল , এখনো দিল্লিতে গেলে সে রকম মোহাচ্ছন্ন ভাব পেয়ে বসে । এই অভিজ্ঞতার মধ্যেই লালকেল্লা উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল।" [১৭]

'বঙ্গভঙ্গ'-(১৯৭৫)
উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

প্রমথনাথ বিশীর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ক ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বঙ্গ ভঙ্গ' এক উল্লেখ যোগ্য সংযোজন । গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ কাল মাঘ ,১৩৮৩ । শ্রীমান তথাগত রায় ও শ্রীমতি অনুরাধা রায়কে গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন লেখক ।

উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত সম্পর্কে ঔপন্যাসিক ব্যাখ্যা অংশে উল্লেখ করেছেন স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইংরেজ তোষণকারী দিনাজশাহী শহরের কোন এক রায়বাহাদুর কর্তৃক ইংলন্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্যাপারটিও একটি বাস্তব সত্য ঘটনা । শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে মহারাণীর বিয়োগ বিষয়ে একটি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । বাল্যকালে প্রমথনাথ সেই কবিতা গ্রন্থটি দেখেছিলেন । কবিতাটির কয়েক ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

" একি অকস্মাৎ অশনি সম্পাত
হল রে ভারত জুড়ে
মাতা ভিক্টোরিয়া সন্তানে ত্যাজিয়া
গেছে রে স্বরগপুরে ।
স্বরগেতে বাজে শুনি সর্ব কাজে
দুন্দুভি নিনাদ শুরু
দেবগণ খুশি, জননীরে তুষি
বুক কাঁপছে দুরু দুরু ।
কিন্তু আমাদের দীন প্রজাদের
দুঃখে বুক ফেটে যায়— "[১৮]

‘ বঙ্গ ভঙ্গ ’ উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল এই কবিতাটির থেকেই ।

এছাড়া রাজসাহী ও দিনাজপুর শহরে স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাবে দু’তিনটি পরিবারের ব্যক্তিদের নিয়ে বঙ্গভঙ্গ উপন্যাস লিখবার পরিকল্পনা নিয়েছেন লেখক। তবে সুরেন বাড়ুজ্জে ও রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক ব্যাক্তি আর সব পাত্র পাত্রী কাল্পনিক।

প্রমথনাথের স্বদেশ চেতনা জাগ্রত হয়েছিল শান্তিনিকেতনে থাকাকালে ।অপরদিকে পিতা নলিনীনাথ বিশীর স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে কারাবরণের ঘটনা প্রমথনাথের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল ।এ ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘ আনন্দমঠ ’ রবীন্দ্রনাথের ‘ গোরা ’, ‘ চার অধ্যায়’, ‘ শেষের কবিতা ’, শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’ , তারাশঙ্করের ‘ধাত্রীদেবতা’ , সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ জাগরী’ , গোপাল হালদারের ‘একদা’ প্রভৃতি উপন্যাস স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল । প্রমথনাথের ‘ বঙ্গভঙ্গ ’ উপন্যাসে উক্ত ঔপন্যাসিকদের প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।।

‘পনেরোই আগষ্ট’ (১৯৭৭)

উপন্যাসের নেপথ্যবর্তী ইতিবৃত্ত

ভারতের রক্তাক্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের ত্রিশ বছরের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে প্রমথনাথের ‘ পনেরোই আগষ্ট ’ (১৯৭৭) উপন্যাসটি সফল সৃষ্টি । গ্রন্থটি ভাদ্র, ১৩৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ।

সম্প্রতি বাংলা উপন্যাসে ভারত বিভাগ ও বাংলা বিভাগ রক্তাক্ত দেশবিভাগ ও কি করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হল এনিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন উপন্যাস লেখায় ব্রতী হননি

কোন ঔপন্যাসিক। এই অসাধ্যকে সাধন করলেন শিল্পী প্রমথনাথ । কত নাম জানা অজানা বীর শহীদের রক্তের বিনিময়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখেছেন প্রমথনাথ বিশী ।

স্বাধীনতা উত্তরকালে ঔপন্যাসিকরা সামাজিক অবক্ষয় , মূল্যবোধের বিনষ্টি , সামাজিক অস্থিরতা, উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন নরেন্দ্র মিত্র , সমরেশ বসু , বনফুল ,আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, সুভাষ সমাজদার প্রমুখ কথাসাহিত্যিক । রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা আন্দোলন , দেশবিভাগ , নরনারীর আত্মত্যাগের কাহিনী দেশবরেণ্য নেতাদের স্বদেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ক উপন্যাস লেখকদের আকৃষ্ট করেনি , জাতীয় গৌরবময় ঐতিহ্যকে তাঁরা তুলে ধরেননি উপন্যাসের কলাকৌশলে প্রমথনাথ সে গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন আলোচ্য উপন্যাস রচনা করে ।

ভারতের স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিক হস্তান্তর নিয়ে ১৯৭৫ সালে দুই বিদেশী কলিনস্ ও লাপিয়ের একটি গ্রন্থ লিখেছেন যার নাম — ' ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট ' তবে এটি উপন্যাস গ্রন্থ নয়।

প্রমথনাথ দিনাজশাহী শহরের কয়েকটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারভূক্ত পাত্র পাত্রীদের নিয়ে এবং গান্ধীজী , অরবিন্দ , সুভাষচন্দ্র , প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বনে লিখেছেন 'পনেরোই আগষ্ট ' উপন্যাসটি ।

' বঙ্গভঙ্গ ' ও ' পনেরোই আগষ্ট ' উপন্যাসদ্বয়ের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন লেখক । দুটি উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর ৪৭ বছরের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে । ঔপন্যাসিক কোন দল বা মতকে প্রাধান্য না দিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে উপন্যাসটি পাঠক সাধারণকে উপহার দিয়েছেন । প্রমথনাথের 'পনেরোই আগষ্ট' উপন্যাসের এটাই হল নেপথ্যবর্তী ইতিহাস ।

উল্লেখপঞ্জী

১) অরুণ সান্যাল ঃ প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস । পৃঃ ৪৫১।

২) প্রমথনাথ বিশী ঃ ' হংসমিথুন' কাব্যগ্রন্থ পৃঃ ১৮০।

৩) প্রমথনাথ বিশী ঃ তদেব পৃঃ ১৮৫।

৪) প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা চিঠিপত্র ।

৫) প্রমথনাথ বিশী , দেয়ালি , কাব্যগ্রন্থ পৃঃ ১৬ ।

৬) শীতল ঘোষ ঃ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস । পৃঃ ৩৯২ ।

৭) প্রমথনাথ বিশী , ' বসন্ত সেনা ' কাব্যগ্রন্থ পৃ ঃ ৭৪ ।

৮) প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' পৃঃ ১৬২ ।

৯) প্রমথনাথ বিশী, তদেব -পৃঃ ৪৫২ ।

১০) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' গ্রন্থ পরিচিতি অংশ ।পৃঃ-১৩।

১১) প্রমথনাথ বিশী , ' জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার ' । পৃঃ ৩৬ ।

১২) প্রমথনাথ বিশী , ' কেরী সাহেবের মুন্সী ' — ভূমিকা অংশ ।

১৩) প্রমথনাথ বিশী , তদেব ভূমিকা ।

১৪) প্রমথনাথ বিশী , তদেব ভূমিকা ।

১৫) অপর্ণাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — বাঙলা ঐতিহাসিক উপন্যাস ।

১৬) প্রমথনাথ বিশী — ' লালকেল্লা ' — ভূমিকা অংশ ।

১৭) প্রমথনাথ বিশী — তদেব ভূমিকা অংশ ।